অপকৌশল। তারা বলে ঃ إِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا —অর্থাৎ আমরা মুসলমান হয়ে গেলে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে। অথচ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এর বিপরীতে। সেমতে তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের মক্কা নগরীকে) নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি? এর চতুষ্পার্শ্বে (হারমের বাইরে) যারা আছে, তাদেরকে (মারধর করে গৃহ থেকে) বহিষ্কার করা হচ্ছে। (এর বিপরীতে তারা শান্তিতে দিনাতিপাত করছে। এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তারা জাজ্বল্যমান বিষয়াদি অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে বিরোধিতা করে এবং ধ্বংসের ভয়কে ঈমানের পথে ওযররূপে ব্যক্ত করে। সত্য প্রকাশের পর এ বোকামি ও জেদের কি কোন ইয়ত্তা আছে যে,) তারা মিথ্যা উপাস্যে তো বিশ্বাস করে যাতে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই (বরং পরিপন্থী অনেক) এবং আল্লাহ্‌র (যার প্রতি বিশ্বাস করার অনেক কারণ ও প্রমাণ আছে, তাঁর) নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করে। (অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শিরক করে। কেননা শিরকের চাইতে নিয়ামতের বড় কোন অস্বীকৃতি আর নেই। বাস্তব কথা এই যে,) সেই ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে হবে, যে (প্রমাণ ব্যতিরেকে) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে (যে, তাঁর শরীক আছে। এবং) যখন তার কাছে সত্য (প্রমাণসহ) আগমন করে, তখন তাকে অস্বীকার করে। (প্রমাণহীন কথাকে সত্য মনে করা এবং প্রামাণ্য কথাকে মিথ্যা মনে করা যে জুলুম, তা বলাই বাহুল্য। যারা এত বেইনসাফ) কাফির, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম নয় কি?) অর্থাৎ অবশ্যই তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। কেননা যেমন অপরাধ তেমনি শাস্তি হয়ে থাকে। মহা অপরাধের মহা শাস্তি। এ পর্যন্ত কাফির ও প্রবৃত্তি-পূজারীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন তাদের বিপরীতদের কথা বলা হচ্ছে) যারা আমার পথে শ্রম স্বীকার করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নৈকট্য ও সওয়াব অর্থাৎ জান্নাতের) পথে পরিচালিত করব। (ফলে তারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا الخ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত) সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গী (দুনিয়াতেও এবং পরকালেও।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তদ্দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, এ কথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা ইত্যাদিকে তারা শরীক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ —অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ কারবার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা বাসনার আসক্তি তাদেরকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তাভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ

—এখানে حيوان শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।—(কুরতুবী)

এতে পার্থিব জীবনকে ক্রীড়া-কৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়া-কৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তদ্রূপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহ্‌কে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং উহা নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্য কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবূল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালিমরা যখন তীরে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে। فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ—আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফিরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহ্‌কেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরও দোয়া কবূল করে নেন। কেননা সে مضطر তথা অসহায়। আল্লাহ্ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবূল করার ওয়াদা করেছেন।—(কুরতুবী)

অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ —অর্থাৎ কাফিরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফিররা আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবুল করা হবে না।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا الاية —ওপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তাঁর খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হত যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (স)-র আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে। —(রূহুল মা'আনী)

এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসারশূন্য। আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্র কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে তা জুটেনি। আল্লাহ্ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হারেম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মু'মিন কাফির নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এতে খুন-খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোন ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোড়া অজুহাত বৈ নয়।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا —জিহাদ-এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফির ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভাল মন্দ, সত্য অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে কোন্ পথ

ধরতে হবে তা চিন্তা করে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন,অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত, সেই পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করলে ইল্‌ম বাড়েঃ এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবুদ্দারদা বলেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার জন্য যারা জিহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার খুলে দেই। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই।

—(মাযহারী) والله اعلم

سورة الروم

সূরা আর-রূম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬০ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝٢ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيَغْلِبُوْنَ ۝٣ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ
وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٤ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الرَّحِيْمُ ۝٥ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ
هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ, লাম, মীম, (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে (৩) নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতি সত্বর বিজয়ী হবে, (৪) কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহ্‌র হাতেই। সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে (৫) আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) রোমকরা একটি নিকটবর্তী অঞ্চলে (অর্থাৎ রোম দেশের এমন এক অঞ্চলে, যা পারস্যের তুলনায় আরবের

নিকটবর্তী। [অর্থাৎ আযরুয়াত ও বুস্‌রা। এগুলো শাম দেশের দুইটি শহর। (কামূস) রোম সাম্রাজ্যের অধীন হওয়ার কারণে এগুলোকে রোমের অঞ্চল বলা হত। এই স্থানে রোমকরা পারসিকদের মুকাবিলায়] পরাজিত হয়েছে। (ফলে মুশরিকরা হর্ষোৎফুল্ল হয়েছে।) কিন্তু তারা (রোমকরা) তাদের (এই) পরাজয়ের পর অতি সত্বর (পারসিকদের বিপক্ষে অন্য যুদ্ধে) তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। (এই পরাজয় ও জয় সব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। কেননা পরাজিত হওয়ার) পূর্বেও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতেই ছিল (ফলে তাদেরকে পরাজিত করে দিয়েছিলেন) এবং (পরাজিত হওয়ার) পশ্চাতেও (আল্লাহ্‌ই ক্ষমতাবান। ফলে তিনি বিজয়ী করে দিবেন।) সেই দিন (অর্থাৎ যেদিন রোমকরা বিজয়ী হবে,) মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র এই সাহায্যের কারণে আনন্দিত হবে। (এই সাহায্য বলে হয় এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের কথায় সত্যবাদী ও বিজয়ী করবেন। কারণ, মুসলমানরা এই ভবিষ্যদ্বাণী কাফিরদের কাছে প্রকাশ করেছিল এবং কাফিররা এ কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছিল। কাজেই মুসলমানদের কথা অনুযায়ী রোমকরা বিজয়ী হলে মুসলমানদের জিত হবে। না হয় একথা বোঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদেরকেও যুদ্ধে জয়ী করা হবে। সেমতে বদরযুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে জয়ী করা হয়েছিল। সর্বাবস্থায় সাহায্যের পাত্র মুসলমানগণই। মুসলমানদের বাহ্যিক পরাজয়ের অবস্থা দেখে কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের বিজয়কে অসম্ভব মনে করা ঠিক নয়। কেননা সাহায্য আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।) তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন। তিনি পরাক্রমশালী (কাফিরদেরকে যখন ইচ্ছা কথায় কিংবা কাজে পরাভূত করে দেন এবং) পরম দয়ালু (মুসলমানদেরকে যখন ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন।) আল্লাহ্‌ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (এবং) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না (তাই এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হবে)। কিন্তু অধিকাংশ লোক (আল্লাহ্‌ তা'আলার কার্যক্ষমতা) জানে না। (বরং শুধু বাহ্যিক কারণাদি দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে তারা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অবান্তর মনে করে। অথচ কারণাদির নিয়ন্ত্রক ও মালিক আল্লাহ্‌ তা'আলা। কারণ পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সহজ এবং কারণের বিপক্ষে ঘটনা ঘটানোও সহজ।

ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার পূর্বে যেমন বাহ্যিক কারণাদির অনুপস্থিতির কারণে তারা তা অস্বীকার করে, তেমনি ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ হতে দেখেও তারা একে দৈবাৎ ঘটনা মনে করে। তারা একে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন মনে করে না। তাই لَا يَعْلَمُونَ শব্দে উভয় বিষয় দাখিল আছে। তারা যে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও নবুয়ত সম্পর্কে গাফেল, এর কারণ এই যে,) তারা কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জ্ঞাত এবং পরকালের ব্যাপারে (সম্পূর্ণ) বেখবর। (সেখানে কি হবে, তারা তা জানে না। ফলে দুনিয়াতে তারা আযাবের কারণাদি থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা করে না এবং মুক্তির কারণাদি তথা ঈমান ও সৎকর্মে ব্রতী হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনীঃ সূরা 'আনকাবুতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্য উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রোম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই আল্লাহ্‌র সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল কাফির। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফির দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খৃস্টান আহ্‌লে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা, ধর্মের অনেক মূলনীতি---যথা পরকালে বিশ্বাস, রিসালত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কোরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন ঃ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الاية

আহ্‌লে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেয ইবনে-হজর প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শামদেশের আযরুআত ও বুস্‌রার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হল এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কনস্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।---(কুরতুবী)

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহ্‌লে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মুকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।---(ইবনে-জারীর ইবনে আবী হাতেম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতু-স্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খাল্ফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র দুশমন তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হল (বলা বাহুল্য, এটা ছিল জুয়া; কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না)। একথা বলে হযরত আবূ বকর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রসূলে করীম (সা) বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কোরআনে এর জন্য بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ উষ্ট্রীর বাজি রাখছি; কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবূ বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হল।---(ইবনে জারীর, তিরমিযী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবূ বকর তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উষ্ট্রী দাবি করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবূ বকরও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবূ বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবূ বকর (রা) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ উষ্ট্রী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। আবূ ইয়ালা ও ইবনে আসাকীরে বারা ইবনে আযেব থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছেঃ هٰذَا السُّحْتُ تَصَدَّقْ بِهٖ---এটা হারাম। একে সদকা করে দাও।---(রূহুল-মা'আনী)

জুয়া ঃ কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে "শয়তানী অপকর্ম" আখ্যা দেওয়া হয়।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

أزلام ও ميسر বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা) উবাই ইবনে খাল্‌ফের সাথে যে দু'তরফা লেনদেন ও হারজিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে سحت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফিকাহ্‌বিদগণ এর জওয়াবে বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল; কিন্তু জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রসূলুল্লাহ্ (সা) পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবূ বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) কখন-ও মদ্যপান করেন নি।

যে রেওয়ায়েতে سحت শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমত হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ স্বীকার করেন নি। যদি অগত্যা সহীহ্ মেনে নেয়া হয়, তবে سحت শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ كسب الحجام سحت এখানে অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে سحت --এর অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে এবং ইবনে আসীর 'নিহায়া' গ্রন্থে শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফিকাহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরী যে, বাস্তবে এই মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌঁছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেওয়ার মধ্যে অন্য কোন শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এ ক্ষেত্রে ফেরত না দেওয়ার এরূপ কোন কারণ বিদ্যমান নেই।

يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ---অর্থাৎ যে দিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেই দিন আল্লাহ্‌র সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যত এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফির ছিল, কিন্তু অন্য কাফিরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর, বিশেষত, যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বোঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। এক. মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ রূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। দুই. তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফিরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।---(রূহুল মা'আনী)

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ—

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে, কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে---এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখন থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্য এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। বলা বাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।

এবার কোরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। يَعْلَمُوْنَ-এর সাথে ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে ظَاهِرًا-কে نكرة এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না---এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় ঃ কোরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশালী ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়, যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ কিছুই নয়। কোরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ্ ও পরকাল চিনে, তার জন্য আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে—জীবনের লক্ষ্য বানায় না। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا الاية—আয়াতে অর্থ তাই।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاۗءُوا السُّوْٓآٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

(৮) তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী

আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পরকালের বাস্তবতার প্রমাণাদি শুনেও কি তাদের দৃষ্টি ইহকালে নিবদ্ধ রয়েছে এবং) তারা কি মনে মনে চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন? (তিনি আয়াতসমূহে খবর দিয়েছেন যে, যথাযথ কারণাদির মধ্য থেকে একটি হচ্ছে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া। নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে কিয়ামত। তারা যদি মনে মনে চিন্তা করত, তবে এসব ঘটনার সম্ভাব্যতা যুক্তি দ্বারা, বাস্তবতা কোরআন দ্বারা এবং কোরআনের সত্যতা অলৌকিকতা দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে যেত। ফলে তারা পরকাল অস্বীকার করত না। কিন্তু চিন্তা না করার কারণে অস্বীকার করেছে। এটাই কি, আরও) অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা কি (কোন সময় বাড়ী থেকে বের হয় না, এবং) পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের (সর্বশেষে) পরিণাম কি হয়েছে? (তাদের অবস্থা ছিল যে,) তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন (তাদের চাইতে বেশী) চাষ করত এবং তারা যতটুকু (সাজসরঞ্জাম ও গৃহ দ্বারা) এটা আবাদ করছে, তারা এর চেয়ে বেশী আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ মু'জিযা নিয়ে আগমন করেছিল। (তারা সেগুলো মানল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ধ্বংসের চিহ্ন শাম দেশের পথে অবস্থিত নির্জন গৃহাদি থেকে সুস্পষ্ট।) বস্তুত (এই ধ্বংসে) আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল অর্থাৎ রসূলগণকে অস্বীকার করে তারা ধ্বংসের যোগ্য হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা। অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, (পরকালে) তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ (শুধু) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহকে (অর্থাৎ নির্দেশাবলী ও সংবাদাদিকে) মিথ্যা বলত এবং (তদুপরি) সেগুলো নিয়ে উপহাস করত (দোযখের শাস্তি হচ্ছে তাদের সে পরিণাম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্য স্বরূপ। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগৎরূপী কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেত

যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেন নি। এগুলো সৃষ্টি করার কোন মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। এ কথাও বলা বাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরী। নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থী। এ কথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসিখুশী জীবন যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। এই সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তাভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়—ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগৎ আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ এই বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে,

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ—অর্থাৎ মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শাম ও ইয়ামনে সফর করে—এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তদ্দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তদ্দ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরী করত। তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ্ ও পরকাল বিস্মৃত হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ করে নি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আযাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ

অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে চিন্তা কর, এই আযাবে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে? অর্থাৎ তারা নিজেরাই আযাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ
يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا
بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَاَمَّا
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

(১১) আল্লাহ্ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এরপর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। (১৩) তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে! (১৫) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে; (১৬) আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। (১৭) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে, (১৮) এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা। (১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন, এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা মখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায়ও সৃষ্টি করবেন। এরপর (সৃজিত হওয়ার পর) তোমরা তার কাছে (হিসাব-নিকাশের জন্য) প্রত্যাবর্তিত হবে। যে দিন কিয়ামত হবে (যাতে উপরোক্ত পুনরুজ্জীবন সম্পন্ন হবে) সেদিন অপরাধীরা (কাফিররা) হতভম্ব হয়ে যাবে (অর্থাৎ কোন যুক্তিযুক্ত কথা বলতে পারবে না) এবং তাদের (তৈরী) দেবতাদের মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না। (তখন) তারা (ও) তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (বলবে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ যে দিন কিয়ামত হবে, সেদিন উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও আরও একটি ঘটনা ঘটবে এই যে, বিভিন্ন মতের) সব মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, তারা তো জান্নাতে আরামেই থাকবে আর যারা কুফর করেছিল এবং আয়াতসমূহ ও পরকালের ঘটনাকে মিথ্যা বলেছিল, তারা আযাবে গ্রেফতার হবে। (বিভক্ত হওয়ার অর্থ তাই। বিশ্বাস ও সৎকর্মের শ্রেষ্ঠত্ব যখন তোমাদের জানা হয়ে গেছে,) অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর (বিশ্বাসগত ও অন্তরগতভাবে অর্থাৎ ঈমান আন, উক্তিগতভাবে অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ কর ও তার যিকর কর এবং কার্যগতভাবে অর্থাৎ সব ইবাদত—ইত্যাদি সম্পন্ন কর, বিশেষত নামায কায়েম কর। মোটকথা, তোমরা সর্বদা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর; বিশেষ করে) সন্ধ্যায় ও সকালে। (আল্লাহ্ বাস্তবে পবিত্রতা বর্ণনার যোগ্যও; কেননা,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা (অর্থাৎ নভোমণ্ডলে ফেরেশতা এবং ভূমণ্ডলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং কেউ বাধ্য হয়ে তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করে; যেমন আল্লাহ্ বলেন وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ কাজেই তিনি যখন এমন সর্বগুণসম্পন্ন সত্তা, তখন তোমাদেরও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা উচিত।) এবং অপরাহ্নে (পবিত্রতা বর্ণনা কর) ও মধ্যাহ্নে (পবিত্রতা বর্ণনা কর। এসব সময়ে নিয়ামত নবায়িত হয় এবং কুদরতের চিহ্ন অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। কাজেই এসব সময়ে পবিত্রতার নবায়ন উপযুক্ত। বিশেষত নামাযের জন্য এ সময়গুলোই নির্ধারিত। مساء শব্দের মধ্যে মাগরিব ও এশা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। عشى শব্দের মধ্যে যোহর ও আসর উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু যোহর পৃথকভাবে উল্লিখিত হওয়ায় শুধু আসর অন্তর্ভুক্ত আছে। সকালও পৃথকভাগে উল্লিখিত হয়েছে। পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়; কেননা, তাঁর শক্তি এমন যে,) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন (যেমন শুক্রবীর্য ও ডিম্ব থেকে মানুষ এবং ছানা; আবার মানুষ ও পক্ষী থেকে শুক্র ও ডিম্ব) এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর (অর্থাৎ শুষ্ক হওয়ার) পর জীবিত (অর্থাৎ সজীব ও শ্যামল) করেন। এভাবেই তোমরা (কিয়ামতের দিন) কবর থেকে উত্থিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ — يُحْبَرُونَ শব্দটি حبور থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আনন্দ, উল্লাস। জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ অর্থাৎ দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্য জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তু উল্লেখ করেছেন। এগুলো সব এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ○

سُبْحَانَ শব্দটি ধাতু। এর ক্রিয়া উহ্য আছে অর্থাৎ سبحوا الله سبحانا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ — এই বাক্যটি প্রমাণ হিসাবে মাঝখানে আনা হয়েছে। حِينَ تُمْسُونَ — অর্থাৎ সন্ধ্যায় حِينَ تُصْبِحُونَ অর্থাৎ সকালে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরী। কারণ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের শেষ ভাগে وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ বলে আরও দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্ণ তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ণ তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়।

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্ণকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে রাখার এক কারণ সম্ভবত এই যে, আসরের সময় সাধারণত কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তসবীহ্ অথবা নামায সম্পন্ন করা স্বভাবত কঠিন। এ কারণেই কোরআনে صلوٰة وسطى

তথা আসরের নামাযের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে ঃ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার উক্তি-গত ও কর্মগত যিকর এর অন্তর্ভুক্ত। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণিত হয়েছে। যিকরের যত প্রকার আছে তন্মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামায আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন, এই আয়াতে পাঞ্জেগানা নামায ও সে সবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, কোরআনে পাঞ্জেগানা নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিবের নামায, حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ শব্দে ফজরের নামায, عَشِيًّا শব্দে আসরের নামায এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ শব্দে যোহরের নামায উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামাযের প্রমাণ আছে অর্থাৎ مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় নামায ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কোরআন পাকে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে ঃ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى—হযরত ইবরাহীম (আ) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবূ দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ থেকে وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত এই তিন আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে তার সারাদিনের আমলের ত্রুটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেওয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে তার রাত্রিকালীন আমলের ত্রুটি দূর করে দেওয়া হয়।—(রূহুল মা'আনী)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝٢٠ وَمِنْ
اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١ وَمِنْ
اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ۝٢٢ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ
مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝٢٣ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ
يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٢٤ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ
اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاۗءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۭ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ
الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۝٢٥ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ
كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝٢٦ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ
اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۭ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۝٢٧

(২০) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (২১) আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২২) তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তাঁর আরও নিদর্শনঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং

তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৪) তাঁর আরও নিদর্শন---তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্য এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে ওঠার জন্য তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। (২৬) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। (২৭) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। (হয় এ কারণে যে, আদম মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে সমস্ত বংশধর লুক্কায়িত ছিল; না হয় এ কারণে যে, বীর্যের মূল উপাদান খাদ্য। চার উপাদানে খাদ্য গঠিত, যার প্রধান উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।) অতঃপর অল্প পরেই তোমরা মানুষ হয়ে (পৃথিবীতে) বিচরণ করছ। তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, (উপকার এই,) যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (কেননা, প্রমাণ করার জন্য চিন্তা দরকার। 'নিদর্শনাবলী' বহুবচন ব্যবহার করার কারণ এই যে, উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে বহুবিধ প্রমাণ নিহিত রয়েছে।) তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। (ভাষা বলে হয় শব্দাবলী বোঝানো হয়েছে, না হয় আওয়াজ ও বাচনভঙ্গি)। এতে জ্ঞানীদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে (এখানেও বহুবচন আনার কারণ তাই)। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন রাতে ও দিনভাগে তোমাদের নিদ্রা (যদিও রাতে বেশী ও দিনে কম ঘুমাও) এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ (যদিও দিনে বেশী এবং রাতে কম অন্বেষণ কর। এ কারণেই অন্যান্য আয়াতে নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং কৃপা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে)। এতে (প্রমাণাদি মনোযোগ সহকারে) শ্রোতা লোকদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলীরূপে রয়েছে। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি (বৃষ্টির সময়) তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যাতে (তার পতিত হওয়ার) ভয়ও থাকে এবং (তদ্দ্বারা বৃষ্টির) আশাও হয়। তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা মৃত্তিকার মৃত (অর্থাৎ শুষ্ক) হওয়ার পর তাকে জীবিত (অর্থাৎ সজীব) করেন। এতে (উপকারী) বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য (শক্তির)

নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে (অর্থাৎ ইচ্ছায়) আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (এতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থায়িত্বের বর্ণনা আছে এবং উপরে خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الخ আয়াতে সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় বর্ণিত হয়েছিল। তোমাদের জন্ম ও বংশবিস্তার, পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক, আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রতিষ্ঠা, ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য দিবারাত্রির পরিবর্তনে নিহিত উপকারিতা, বারিবর্ষণ এবং এর সূচনা ও চিহ্নের বিকাশ, বিশ্বের উল্লিখিত এসব ব্যবস্থাপনা ততক্ষণ কায়েম থাকবে, যতক্ষণ দুনিয়া কায়েম রাখা উদ্দেশ্য। একদিন এগুলো সব খতম হয়ে যাবে।) অতঃপর (তখন এই হবে যে) যখন তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে ডাক দেবেন. তখন তোমরা একযোগে উঠে আসবে (এবং অন্য ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়ে যাবে, যা এখানে আসল উদ্দেশ্য। উপরে শক্তির নিদর্শনাবলী থেকে জানা হয়ে থাকবে যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু (ফেরেশতা, মানব ইত্যাদি) আছে, সব তাঁরই (মালিকানাধীন)। সব তাঁরই আজ্ঞাবহ (কুদরতের অধীন) এবং (এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন (এটা কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত)। অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এটা (অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি) তাঁর জন্য (মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে প্রথমবার সৃষ্টি করার চাইতে) সহজ। (যেমন মানবিক স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে সাধারণ রীতি এই যে, কোন বস্তু প্রথমবার তৈরী করার চাইতে দ্বিতীয়বার তৈরী করা সহজ।) আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ। (আকাশে তাঁর মত সহায় কেউ নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। আল্লাহ্ বলেন, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) তিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ও) প্রজ্ঞাময়। (উপরে বর্ণিত কার্যাবলী থেকে শক্তি ও প্রজ্ঞা উভয়ই প্রকাশমান। সুতরাং তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এতে যে বিরতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে প্রজ্ঞা ও উপকারিতা নিহিত আছে। সুতরাং শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রমাণিত হওয়ার পর এখনই পুনর্বার সৃষ্টি না হওয়ার কারণে একে অস্বীকার করা মূর্খতা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফিরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, অতঃপর চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান।

তাঁর কোন শরীক ও অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গম্বরদের মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম হওয়ার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহ এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলী' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

আল্লাহ্র কুদরতের প্রথম নিদর্শন ঃ মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে. তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এটিই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, এ কথা হযরত আদম (আ)-এর দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

আল্লাহ্র কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন ঃ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষদের সংগিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দুইটি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্র পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্য এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا – অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কোরআন পাক একটি মাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলা বাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতিনীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি; এর জন্য পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য----মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তা-ই করা হয়েছে অর্থাৎ একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহ্‌ভীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কোরআনে সর্বত্র وَاخْشَوْا - اتَّقُوا اللّٰهَ ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে, কোন আইন তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারে না এবং কোন আদালতও এ ব্যাপারে পুরাপুরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন পাকের সেই সব আয়াত মনোনীত করেছেন, যেগুলোতে আল্লাহভীতি, তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আল্লাহ্‌-ভীতিই প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের জামিন হতে পারে।

তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে কেবল আইনগত রাখেন নি; বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্রূপ করা হয়েছে। তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য। এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালবাসা রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল আইনগত সম্পর্ক রাখেন নি ; বরং তাদের অন্তরে সম্প্রীতি ও দয়া গ্রথিত করে দিয়েছেন। مودت و ود এর শাব্দিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালবাসা ও প্রীতি। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছেন---এক, مودت ও দ্বিতীয় رحمت। সম্ভবত এতে ইঙ্গিত আছে যে, مودت তথা ভালবাসার সম্পর্ক যৌবনকালের সাথে। এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালবাসতে বাধ্য করে। বার্ধক্যে যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে দয়া ও কৃপা স্বভাবগত হয়ে যায়।-----(কুরতুবী)

এরপর বলা হয়েছে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ---অর্থাৎ এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে 'অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লিখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয়---বহু নিদর্শন।

আল্লাহ্র কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন ঃ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য ; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষায় বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্ন রূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও এক রূপ।--- تبارك الله احسن الخالقين

এমনিভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতামাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানবজাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তাভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে নেওয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী, ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা ও এবংবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ— অর্থাৎ এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন ঃ মানুষের রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাতে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাতে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাতে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাতের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্য স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোন কোন তফসীরকার সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ সংসার-বিমুখতা এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয় বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দান। আমরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোন কোন সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে; কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিযিকদাতা হিসাবে উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

---অর্থাৎ যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণ সম্ভবত এই যে, দৃশ্যত নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়গম্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যই উপকারী, যারা পয়গম্বরগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়--- কোন হঠকারিতা করে না।

আল্লাহ্‌র কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন ঃ পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশংকা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টি দ্বারা শুষ্ক ও মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

---অর্থাৎ এতে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে।

আল্লাহ্‌র কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন ঃ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোন ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই বোঝানোর জন্য এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ---যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার مثل বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মত হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার যে مثل আছে, একথা কোরআনের কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوٰةٍ কিন্তু مثال ও مثل থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে। والله اعلم

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ
شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ
كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۞ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا
اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ
نّٰصِرِيْنَ ۞ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ۞ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا
لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۞ وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ
ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۞
لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۞ اَمْ اَنْزَلْنَا
عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ۞ وَاِذَآ اَذَقْنَا
النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ
اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ۞ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۞ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى
حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ
اللّٰهِ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ

أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ
مِنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

(২৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনঃ তোমাদের আমি যে রুযী দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, যেরূপ নিজেদের লোককে ভয় কর? এমনিভাবেই আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (২৯) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতা-বশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে বোঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) তুমি একনিষ্ঠ-ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ্র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, (৩২) যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহবান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা লুটে নাও, সত্বরই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন দলীল নাযিল করেছি, যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে আন-ন্দিত হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদের কোন দুর্দশা পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৮) আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুশরিকদেরও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে---এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের

আশায় পবিত্র অন্তরে যা দিয়ে থাকে, অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৪০) আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র ও মহান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (শিরককে নিন্দনীয় ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে) তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন (দেখ) তোমাদের আমি যে মাল দিয়েছি, তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের শরীক যে, তোমরা ও তারা (ক্ষমতার দিক দিয়ে) তাতে সমান হও এবং যাদের (কাজ-কর্মের সময়) এতটুকু খেয়াল রাখ, যেমন নিজেদের (স্বাধীন শরীক) লোকদের খেয়াল রাখ এবং তাদের অনুমতি নিয়ে কাজকর্ম কর অথবা কমপক্ষে বিরোধিতারই ভয় কর। বলা বাহুল্য, দাসদাসীরা এমন শরীক হয় না। সুতরাং তোমার দাস তোমার মত মানুষ এবং অন্য অনেক বিষয়ে তোমার সমকক্ষ ও তোমারই মত। পার্থক্য কেবল এক বিষয়ে; তুমি ধনদৌলতের অধিকারী---সে অধিকারী নয়। এতদসত্ত্বেও সে যখন তোমার বিশেষ কাজ-কারবারে তোমার অংশীদার হতে পারে না, তখন তোমাদের মিথ্যা দেবদেবী, যারা আল্লাহ্র দাস এবং কোন সত্তাগত ও গুণগত দিক দিয়েই আল্লাহ্র সমতুল্য নয়; বরং কোন কোনটি আল্লাহ্র সৃষ্টদের হাতে গড়া, তারা উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক কিরূপে হতে পারে? আমি যেমন শিরককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এই প্রমাণ বর্ণনা করেছি।) এমনিভাবে আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (তদনুযায়ী তাদের উচিত ছিল সত্যের অনুসরণ করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা; কিন্তু তারা সত্যের অনুসরণ করে না।) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা (কোন বিশুদ্ধ) প্রমাণ ছাড়াই (শুধু) নিজেদের (মিথ্যা) খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। অতএব আল্লাহ্ যাকে (হঠকারিতার কারণে) পথভ্রষ্ট করেন তাকে কে বোঝাবে? [এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে ক্ষমার্হ; বরং উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কাজ আপনি করেছেন। যখন এই পথভ্রষ্টদের আযাব হবে, তখন] তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (উপরের বিষয়বস্তু থেকে যখন তওহীদের স্বরূপ ফুটে উঠেছে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বলা হচ্ছে,) তুমি (মিথ্যা ধর্ম থেকে) একমুখী হয়ে নিজেকে (সত্য) ধর্মের উপর কায়েম রাখ। সবাই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতার অনুসরণ কর, যে যোগ্যতার উপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ('আল্লাহ্র ফিতরাত'-এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এই যোগ্যতা রেখেছেন যে, সে যদি সত্যকে শুনতে ও বুঝতে চায়, তবে বুঝতে সক্ষম হয়। এর অনুসরণের অর্থ, এই যোগ্যতাকে কাজে লাগানো এবং তদনুযায়ী আমল করা। মোটকথা, এই ফিতরাত

অনুসরণ করা দরকার এবং) যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। অতএব সরল ধর্ম (-এর পথ) এটাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে) জানে না। (ফলে এর অনুসরণ করে না। মোটকথা,) তোমরা আল্লাহ্র অভিমুখী হয়ে ফিতরাতের অনুসরণ কর, তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর বিরোধিতা ও বিরোধিতার শাস্তিকে) ভয় কর---এবং (ইসলাম গ্রহণ করে) নামায কায়েম কর—(এটাও কার্যত তওহীদ,) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে (অর্থাৎ সত্য ছিল এক এবং মিথ্যা অনেক। তারা সত্য ত্যাগ করে মিথ্যার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এটাই খণ্ড-বিখণ্ড করা অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক পথ ধরেছে) এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। (সত্যের উপর থাকলে একই দল থাকত। সত্যত্যাগী সবগুলো পথ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও) প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। যে তওহীদের প্রতি আমি আহ্বান করি, তা অস্বীকার করা সত্ত্বেও বিপদমুহূর্তে মানুষের অবস্থা ও কথার মধ্যে ফুটে ওঠে। এ তওহীদ যে সৃষ্টিগত, তারও সমর্থন পাওয়া যায়। সে মতে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন (অস্থির হয়ে) তারা তাদের পালনকর্তার অভিমুখী হয়ে তাঁকে ডাকে (অন্য সব দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে; কিন্তু) অতঃপর (অদূর ভবিষ্যতেই এই অবস্থা হয় যে,) তিনি যখন তাদেরকে কিছু রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল (আবার) তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, যার অর্থ এই যে, আমি তাদেরকে যা কিছু (আরাম আয়েশ) দিয়েছি, তা অস্বীকার করে (এটা যুক্তিগতভাবেও মন্দ)। অতএব আরও কিছুদিন মজা লুটে নাও। এরপর সত্বরই (আসল সত্য) জানতে পারবে। (তারা যে তওহীদ স্বীকার করার পরও শিরক করে, তাদের জিজ্ঞাস করা উচিত যে, এর কারণ কি?) আমি কি তাদের কাছে কোন দলীল (অর্থাৎ কিতাব) নাযিল করেছি, যে তাদেরকে আমার সাথে শরীক করতে বলে? (অর্থাৎ তাদের কাছে এর কোন ইতিহাসগত প্রমাণও নেই। তাদের শিরক যে যুক্তিরও পরিপন্থী একথা বিপদমুহূর্তে তাদের স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়। কাজেই শিরক আদ্যোপান্ত বাতিল। এরপর এই বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট বর্ণিত হচ্ছে ঃ) আমি যখন মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে (এমন) আনন্দিত হয় (যে, আনন্দে মত্ত হয়ে শিরক শুরু করে দেয়; যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে।) আর তাদের কু-কর্মের ফলে যদি তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (এখানে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এই পরিশিষ্টের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য প্রথম বাক্য إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ —এতে বলা হয়েছে যে, তাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ আনন্দে মত্ত হওয়া। দ্বিতীয় বাক্যটি কেবল বৈপরীত্য প্রকাশ করার জন্য আনা হয়েছে। কেননা, উভয় অবস্থায় এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, এর সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে কম ও দুর্বল। সামান্য বিষয়ও এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়। এরপর তার দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ (এরা যে শিরক করে, তবে)

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। (মুশরিকরা একথা স্বীকারও করত যে, রুযীর হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্র কাজ। এক আয়াতে আছেঃ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا الخ) এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য (তওহীদের) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (অর্থাৎ তারা বুঝে এবং অন্যরাও বুঝে যে, যে এরূপ সর্বশক্তিমান হবে, সে-ই উপাসনার যোগ্য হবে) অতএব (যখন জানা গেল যে, রুযীর হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে, তখন এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, কার্পণ্য করা নিন্দনীয়। কেননা, কৃপণতা দ্বারা অবধারিত রিযিকের বেশী পাওয়া যাবে না। তাই সৎ কাজে ব্যয় করতে কৃপণতা করবে না; বরং) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও (তাদের প্রাপ্য দাও।) এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (আমি যে বলেছি, 'এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে'—এর কারণ এই যে, আমার কাছে ধন-সম্পদ ব্যয় করাই কৃতকার্যতার কারণ নয়; বরং এর আইন এই যে,) যা কিছু তোমরা (দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে, যেমন কাউকে কোন কিছু) এই আশায় দেবে যে, তা মানুষের ধন-সম্পদে (শামিল হয়ে অর্থাৎ তাদের মালিকানায় ও অধিকারে) পৌঁছে তোমাদের জন্য বেশী (হয়ে) আসবে, (যেমন বিবাহ্ ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে প্রায়ই এই উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ দেওয়া হয় যে, আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আরও কিছু বেশী শামিল করে আমাদেরকে দেবে।) আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। (কেননা, আল্লাহ্র কাছে কেবলমাত্র সেই ধন-সম্পদই পৌঁছে ও বৃদ্ধি পায়, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়। হাদীসেও বলা হয়েছে, একটি মকবুল খেজুর ওহুদ পাহাড়ের চাইতেও বেশী বেড়ে যায়। যেহেতু উপরোক্ত ধন-সম্পদে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়ত থাকে না। কাজেই কবূলও হয় না, বাড়েও না) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাদের মধ্যে যারা যাকাত (ইত্যাদি) দিয়ে থাকে, তারাই আল্লাহ্র কাছে (তাদের প্রদত্ত ধন) বৃদ্ধি করতে থাকবে। (আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার এই আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ রিযিকদাতা। সুতরাং এই বিষয়বস্তু তওহীদকে জোরদার করার একটি উপায়। তাই এখানে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এখানে তওহীদ বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য, তাই এরপর তওহীদই বর্ণিত হচ্ছে)

আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর (কিয়ামতে) তোমাদের জীবিত করবেন। (এগুলোর মধ্যে কোন কোন বিষয় কাফিরদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং কোন কোনটি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। মোটকথা, আল্লাহ্ এমনি শক্তিশালী, এখন বল), তোমাদের দেবদেবীদের মধ্যেও এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটি করতে পারে? (বলা

বাহুল্য, কেউ নেই। কাজেই প্রমাণিত হল যে) আল্লাহ্ তাদের শিরক থেকে পবিত্র ও মহান (অর্থাৎ তাঁর কোন শরীক নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা সব বিষয়ে তোমাদের শরীক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেও অধিকার দাও না। কোন ক্ষুদ্র ও মামুলী শরীককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগৎ আল্লাহ্র সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ অথবা তাঁর শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর?

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার; কিন্তু প্রতিপক্ষ কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোন জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

তৃতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিক-সুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মুখ করুন فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ فِطْرَةَ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ বাক্যটি পূর্ববর্তী فأقم বাক্যের ব্যাখ্যা এবং دين حنيف-এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ دين حنيف হচ্ছে دين فطرت। পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র ফিতরাত বলে সেই ফিতরাত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

এক. ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতামাতা তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এ এক হাদীসে তাই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

দুই. ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। এক. এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে: لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ এখানে خلق الله বলে পূর্বোল্লিখিত فطر الله-কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্র এই ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতামাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদী অথবা খৃস্টান করে দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ্ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফির বেশী পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন?

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিযির (আ) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরতে কুফর ছিল। তাই খিযির (আ) তাকে হত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরী। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন বিষয় হল না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের সওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে? কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ্ হাদীসের অনুরূপ ফিকাহ্বিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতামাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতামাতা কাফির হলে সন্তানকেও কাফির ধরা হয় এবং তার কাফন-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না।

এসব আপত্তি ইমাম তুরপশতী 'মাসাবীহ্' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতামাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফির হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। খিযির (আ)-এর হাতে নিহত বালক কাফির হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বোঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ্প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতামাতা সন্তানকে ইহুদী অথবা খৃস্টান করে দেওয়ার যে কথা বুখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ্প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত; কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষিগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যত মূল ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষিগণের উক্তির এই অর্থ মুহাদ্দিস-ই-দেহলভী (র) মেশকাতের টীকা 'লামআতে' বর্ণনা করেছেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' গ্রন্থে লিখিত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (র)-র আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন মন ও মেযাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদ্দ্বারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ——আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ যে জীবকে স্রষ্টা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ-প্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যদ্দ্বারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ——উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত ফিতরত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফির করতে পারে; কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না।

এ থেকেই مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ——আয়াতের মর্মও

পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি জ্বিন ও মানবকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করি নি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি ইবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ সংঘটিত হবে না।

বাতিলপন্থীদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরয ঃ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে অর্থাৎ পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, মানুষকে এমন সব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিষ্ক্রিয় অথবা দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশির ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থীদের পুস্তকাদি পাঠ করা।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ—পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামায কায়েম করতে হবে। কেননা, নামায কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ —অর্থাৎ যারা শিরক করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا—অর্থাৎ এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাব-ধর্মে ও সত্যধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। شِيَعًا শব্দটি شِيعَةٌ-এর বহুবচন। কোন একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে شِيعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাবধর্ম ছিল তওহীদ। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতি এক দল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মযহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মযহাবকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ—অর্থাৎ প্রত্যেক

দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ —পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিযিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা, হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এবং হাসান বসরী (র)-র মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হাষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। এক. আত্মীয়স্বজন, দুই. মিসকীন, তিন. মুসাফির। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ্ তোমাদের ধনসম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবি, কোন অনুগ্রহ নয়।

ذَا الْقُرْبٰى বলে বাহ্যত সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, মাহ্‌রাম হোক বা না হোক। حَقَّهٗ বলেও ওয়াজিব---যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হোক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হোক---সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহ-মূলক দান অন্যদের করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এমন কি, তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেনঃ যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরীব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয়; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে ন্যূনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দানও তাদের প্রাপ্য। হযরত হাসান বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হল আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য।----(কুরতুবী)

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকলে আর্থিক সাহায্য, নতুবা সদ্ব্যবহার।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ اَمْوَالِ النَّاسِ—এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত একে অপরকে যা দেয়, তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সেও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করে উপহার উপঢৌকন দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি এই নিয়তে দেয় যে, তার ধনসম্পদ আত্মীয়ের ধনসম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশি নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহ্‌র কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কোরআন পাকে এই 'বেশি'-কে ربوا (সূদ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সূদের মতই ব্যাপার।

মাস'আলা ঃ প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপঢৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্য নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগ মত এর প্রতিদান দেবে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কেউ কোন উপঢৌকন দিলে সুযোগ মত তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস----(কুরতুবী) তবে এই প্রতিদান এভাবে দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾
فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ
اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ
فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

(৪১) স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪২) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৪৩) যে দিবস আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাহৃত হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৪৪) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্য সে-ই দায়ী এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। (৪৫) যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন। নিশ্চয় তিনি কাফিরদের ভালবাসেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শিরক ও গোনাহ্ এমন মন্দ যে,) স্থলে ও জলে (অর্থাৎ সারা বিশ্বে) মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে উদাহরণত (দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা); যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান—যাতে তারা (এসব কর্ম থেকে) ফিরে আসে। (অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ—"কোন কোন কর্মের" বলার কারণ এই যে, সব কর্মের শাস্তি দিতে গেলে তারা জীবিতই থাকবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ---এই অর্থে পূর্বোক্ত আয়াতে وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ বলা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক গোনাহ্ তো আল্লাহ্ মাফই করে দেন---কোন কোন আমলেরই শাস্তি দেন মাত্র। মোটকথা, কুকর্মই যখন সর্বাবস্থায় শাস্তির কারণ, তখন শিরক ও কুফর তো সর্বাধিক আযাবের কারণ হবে। মুশরিকরা যদি একথা মেনে নিতে ইতস্তত করে, তবে) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্বে যারা (কাফির ও মুশরিক) ছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল। (অতএব দেখ, তারা আল্লাহ্র আযাবে কিভাবে ধ্বংস হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, শিরকের বিপদ ভয়ঙ্কর। কেউ কেউ অন্য প্রকার কুফরে লিপ্ত ছিল, যেমন লূতের সম্প্রদায় ও কারূন এবং বানর ও শূকরে রূপান্তরিত জাতি। আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা এবং নিষেধ অমান্য করার কারণে তারা কুফর ও লানতে লিপ্ত হয়। মক্কার কাফিরদের বিশেষ ও প্রসিদ্ধ অবস্থা 'শিরক' হওয়ার কারণে বিশেষভাবে শিরক উল্লেখ করা হয়েছে।

যখন প্রমাণিত হল যে, শিরক আযাবের কারণ, তখন হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) আপনি সরল ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামী তওহীদের) উপর নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাহাত হবে না। (অর্থাৎ দুনিয়াতে বিশেষ আযাবের সময়কে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ওয়াদার ওপর পিছিয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত দিন যখন আসবে, তখন একে প্রত্যাহার করবেন না এবং বিরতি ও সময় দেবেন না। এই বাক্যে শিরকের পারলৌকিক শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যেমন كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الخ ও ظَهَرَ الْفَسَادُ الخ বাক্যে ইহলৌকিক শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।)

সেদিন (আমলকারী) মানুষ (আমলের প্রতিদান হিসাবে) বিভক্ত হয়ে পড়বে (এভাবে যে,) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্য সে দায়ী এবং নিন্দনীয় কাজ। যারা সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেবেন। যারা সৎকর্ম করছে, তারা নিজের লোভের জন্যই উপকরণ তৈরি করে নিচ্ছে; এর ফল হবে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ সৎ লোককে নিজ অনুগ্রহে (উত্তম) পুরস্কার দেবেন---যারা ঈমান এনেছে এবং তারা সৎকর্মও; (এবং এ থেকে কাফিররা বঞ্চিত থাকবে; যা পূর্ববর্তী আয়াতের فعليه كفره থেকে জানা যায়। যার কারণ হলো এই যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না বরং কুফরের কারণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ---অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ বিপদ বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গোনাহ্ ও কুকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গোনাহ্ আসে।

অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গোনাহ্ তো আল্লাহ্ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ার বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের

গোনাহ্; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরাপুরি প্রতিফল দেওয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহ্র কারণেই বিপদ আসে না, বরং অনেক গোনাহ্ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোন কোন গোনাহ্র কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহ্র কারণে বিপদ এলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না; বরং অনেক গোনাহ্ তো আল্লাহ্ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরাপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত্র; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে ঃ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا—যাতে আল্লাহ্ তোমাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফিল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গোনাহ্ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্য উপকারপ্রদ ও একটি বড় নিয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গোনাহের কারণে আসে ঃ তাই কোন কোন আলিম বলেন, যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশুপক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গোনাহ্র কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এরা সবাই গোনাহ্গার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে না; বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে।—(রূহুল মা'আনী) কারণ, প্রথমত একজনের জুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও জুলুম করার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়ত তার জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্দারা সব মানুষই কম বেশি প্রভাবান্বিত হয়।

একটি আপত্তির জওয়াব ঃ সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা এবং কাফিরের জান্নাত। কাফিরকে তার সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধনসম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মু'মিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মু'মিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ—অর্থাৎ দুনিয়াতে পয়গম্বরগণের ওপর সর্বাধিক

বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাদের নিকটবর্তীদের ওপর আসে।

এসব সহীহ্ হাদীস বাহ্যত আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মু'মিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এবং কাফিররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গোনাহ্র কারণে হত, তবে ব্যাপার উল্টা হত।

জওয়াব এই যে, আয়াতে গোনাহ্কে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারও ওপর কোন বিপদ এলে তা একমাত্র গোনাহ্র কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গোনাহ্গার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ঔষধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এ স্থলে ঠিক; কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ঔষধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিয়াময়-কারী ঔষধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গোনাহ্র কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গোনাহ্র আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গোনাহ্ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, আয়াতে বলা হয়নি যে, গোনাহ্ না করলে কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর; যেমন পয়গম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গোনাহ্ নয়; বরং তাঁদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকেই গোনাহ্র ফল সাব্যস্ত করেনি; বরং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, সেইসব বিপদাপদকে সাধারণত গোনাহ্র এবং বিশেষত প্রকাশ্য গোনাহ্র ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়; বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যও প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মুসীবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্য রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গোনাহ্গার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ

বলা যায় না যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ। হ্যাঁ, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ—যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গোনাহ্ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

জ্ঞাতব্যঃ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার; এক. বাহ্যিক ও দুই. অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বোঝায়, যা সবার দৃষ্টি-গ্রাহ্য বোধগম্য কারণ। অভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্প, (মৌসুমী বায়ু) যা উপরের বায়ুতে পৌঁছে বরফে পরিণত হয় এবং অতঃপর সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম উভয় প্রকার হতে পারে। কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ত্রুটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণ প্রাকৃত-বৈষয়িক, যা সৎ-অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুত্তাকী ও ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা; যেমন নমরূদের অগ্নিকে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ওজনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্য। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহ আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারও জন্য সুখকর হয় এবং কারও জন্য বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভালমন্দ কর্মকাণ্ডও বিপদাপদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণ মাত্রায় সুখ ও শান্তি লাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের ওপরই একত্রিত আছে; কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবি করে। এমতাবস্থায় তার এসব অভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণ মাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে

মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায় কিন্তু অভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখশান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে।

এমনিভাবে কোন কোন সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন উচ্চস্তরের নবী-রসূল ও ওলীয়ে কামিলের জন্য প্রতিকূল করে তাঁর পরীক্ষার জন্যও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আযাবের মধ্যে পার্থক্য ঃ বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গোনাহ্র শাস্তি দেওয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফ্ফারার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয়-ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বোঝা যাবে? এর পরিচয় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ্ তাঁর অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ঔষধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মত সন্তুষ্ট থাকে; বরং এর জন্য সে টাকা পয়সাও ব্যয় করে; সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমনকি, কুফরী বাক্যে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহ্র প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয়; বরং মেহেরবানী ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ আল্লাহ্র গযব ও আযাবের আলামত। والله اعلم

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ
وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا
مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ اَللّٰهُ

الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ
وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ
قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ
اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰي
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَىِٕنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ
يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۗءَ اِذَا وَلَّوْا
مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ
يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾

(৪৬) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আপনার পূর্বে আমি রসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (৪৮) তিনি আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও—তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌঁছান; তখন তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে-নিরাশ ছিল। (৫০) অতএব আল্লাহ্র রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (৫১) আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২) অতএব আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও

আহবান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। (৫৩) আপনি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ তারা মুসলমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত, তওহীদ ও নিয়ামতের) নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি (বৃষ্টির পূর্বে) সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন (এক তো মন প্রফুল্ল করার জন্য এবং) যাতে (এর পরে বৃষ্টি হয় এবং) তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান (অর্থাৎ বৃষ্টির উপকারিতা উপভোগ করান) এবং (এ কারণে বায়ু প্রেরণ করেন,) যাতে (এর মাধ্যমে পালের) নৌকাসমূহ তাঁর নির্দেশে বিচরণ করে এবং যাতে বায়ুর সাহায্যে নৌকায় সমুদ্র ভ্রমণ করে) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর (অর্থাৎ নৌকা চলা এবং অনুগ্রহ তালাশ করা উভয়ই বাতাস প্রেরণ দ্বারা অর্জিত হয়--প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে এবং দ্বিতীয়টি নৌকার মধ্যস্থতায়) এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (এসব অকাট্য প্রমাণ ও নিয়ামত সত্ত্বেও মুশরিকরা আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ শিরক, পয়গম্বরের বিরোধিতা, মুসলমানদের নির্যাতন ইত্যাদি দুষ্কর্ম করে। আপনি তজ্জন্যে দুঃখিত হবেন না। কেননা আমি সত্বরই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। এতে তাদের পরাভূত এবং সত্যপন্থীদের প্রবল করব; যেমন পূর্বেও হয়েছে। সেমতে) আমি আপনার পূর্বে অনেক পয়গম্বর তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে (সত্য প্রমাণের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন যাতে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কেউ করে না।) অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছি। সত্যকে মিথ্যা বলা, সত্যপন্থীদের বিরোধিতা করা ছিল অপরাধ। এই শাস্তি দিয়ে আমি তাদের পরাজিত এবং সত্যপন্থী-দের বিজয়ী করেছি।) মু'মিনকে প্রবল করা (প্রতিশ্রুতি ও রীতি অনুযায়ী) আমার দায়িত্ব। (আল্লাহ্র এই শাস্তিতে কাফিরদের ধ্বংস হওয়া অথবা পরাভূত হওয়া এবং মুসলমানদের রক্ষা পাওয়া ও বিজয়ী হওয়া অবধারিত ছিল। মোটকথা, এই কাফিরদের কাছ থেকেও এমনিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে---দুনিয়াতে কিংবা মৃত্যুর পরে। সান্ত্বনার এই বিষয়বস্তু মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর বায়ু প্রেরণের উল্লিখিত কতক সংক্ষিপ্ত ফলাফলের বিবরণ দান করা হচ্ছে) আল্লাহ্ এমন শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় ও অনুগ্রহদাতা) যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা (অর্থাৎ বায়ু) মেঘমালাকে (যা বায়ু আসার পূর্বে বাষ্প হয়ে উঠে মেঘমালায় রূপান্তরিত হয়েছিল; আবার কোন সময় এই বায়ু দ্বারাই বাষ্প উত্থিত হয়ে মেঘমালা হয়ে যায়। এরপর বায়ু মেঘমালাকে তার স্থান থেকে অর্থাৎ শূন্য থেকে অথবা মাটি থেকে) সঞ্চালিত করে। অতঃপর আল্লাহ্ মেঘমালাকে (কখনও তো) যেভাবে

ইচ্ছা আকাশে (অর্থাৎ শূন্যে) ছড়িয়ে দেন এবং (কখনও) তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন। (بسط-এর মর্ম একত্রিত করে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া, كَيْفَ يَشَاءُ-এর অর্থ কোন সময় অল্প দূর পর্যন্ত এবং কোন সময় বেশি দূর পর্যন্ত এবং كِسَفًا-এর উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত হয় না, বিচ্ছিন্ন থাকে।) এরপর (উভয় অবস্থায়) তুমি বৃষ্টিকে দেখ যে, তার মধ্য থেকে নির্গত হয়। (একত্রিত মেঘমালা থেকে তো প্রচুর বর্ষিত হয়। কোন কোন ঋতুতে বিচ্ছিন্ন মেঘমালা থেকেও প্রচুর বর্ষণ হয়।) এরপর (অর্থাৎ মেঘমালা থেকে নির্গত হওয়ার পর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা পৌঁছান তখন সে আনন্দিত হয়। তারা প্রথমত তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার ব্যাপারে আনন্দিত হওয়ার পূর্বে (সম্পূর্ণ) নিরাশ ছিল। (অর্থাৎ এইমাত্র নিরাশ ছিল এবং এইমাত্র আনন্দ লাভ করেছে। আসলেও দেখা যায়, এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়।) অতএব আল্লাহ্‌র রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) ফল দেখ, কিভাবে তিনি (এর সাহায্যে) মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত (অর্থাৎ সজীব-সতেজ) করেন। (এটা নিয়ামত ও তওহীদের দলীল হওয়া ছাড়া এ বিষয়েরও দলীল যে, আল্লাহ্ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। এ থেকে জানা গেল যে, যে আল্লাহ্ মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত করেন,) নিশ্চয়ই তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন; তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। (মৃত্তিকা জীবিত করার সাথে মিল রেখে মৃত জীবিত করার এই বিষয়বস্তু মধ্যবর্তী বাক্য ছিল। অতঃপর বৃষ্টি ও বায়ুর কথা বলা হচ্ছে। এতে গাফিলদের অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা আছে অর্থাৎ গাফিলরা এমন অকৃতজ্ঞ যে, এমন বড় বড় নিয়ামতের পর) যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে (শুষ্ক ও) হলদে হয়ে যেতে দেখে (অর্থাৎ সজীবতা বিনষ্ট হয়ে যায়।) তবে তারা এরপর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় (এবং পূর্ববর্তী সব নিয়ামত বিস্মৃত করে দেয়)। অতএব (তারা যখন এতই গাফিল ও অকৃতজ্ঞ, তখন প্রমাণিত হল যে, তারা সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন। কাজেই তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখ করাও অনর্থক। কেননা) আপনি মৃতদেরকে (তো) শোনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরকে (ও) আওয়াজ শোনাতে পারবেন না, (বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং ইঙ্গিতও দেখতে পায় না)। আপনি (এমন) অন্ধদেরকে (যারা চক্ষুষ্মানের অনুসরণ করে না) তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবেন না (অর্থাৎ তারা চৈতন্য-বিকল ও মৃতের সমতুল্য)। আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, অতঃপর মেনে (ও) চলে। (আর এরা যখন মৃত, বধির ও অন্ধদের সমতুল্য, তখন তাদের কাছ থেকে ঈমান আশা করবেন না এবং দুঃখ করবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কৃপাবশত মু'মিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যত এর ফলে কাফিরদের মুকাবিলায় মুসলমানদের কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মু'মিন বলে কাফিরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে জিহাদ করে, তাদের বোঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জিহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে; যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে আছে ঃ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا — অর্থাৎ তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তা'আলা পরিণামে মু'মিনদেরই বিজয় দান করেন----যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তা-ই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মু'মিন, আল্লাহ্র বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফিরদের বিজয়ের সময়ও গোনাহ্ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহ্র সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ্ তা'আলা দয়াবশত সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন, অতএব এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কি না, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কি না---সূরা নমলের তফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۝ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا

لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۭ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝٥٥ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ
وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا يَوْمُ
الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٥٦ فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝٥٧ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَلَىِٕنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝٥٨ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٩ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ
لَا يُوْقِنُوْنَ ۝٦٠

(৫৪) আল্লাহ্, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশি অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ হত। (৫৬) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ্র কিতাব মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই পুনরুত্থান দিবস; কিন্তু তোমরা তা জানতে না।' (৫৭) সেদিন জালিমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেওয়া হবে না! (৫৮) আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী। (৫৯) এমনিভাবে আল্লাহ্ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। (৬০) অতএব আপনি সবর করুন। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ এমন, যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেছেন (এতে শৈশবের প্রথমাবস্থা বোঝানো হয়েছে।) অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি (অর্থাৎ যৌবন) দান করেছেন, অতঃপর শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন

এবং তিনি (সব কাজ সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ (এবং ক্ষমতা প্রয়োগে) সর্বশক্তিমান। সুতরাং এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন নয়। এ হচ্ছে পুনরুত্থানের সম্ভাবনার বর্ণনা। অতঃপর তার বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে।) যেদিন কিয়ামত হবে, অপরাধীরা (অর্থাৎ কাফিররা কিয়ামতের ভয়াবহতা ও অস্থিরতা দেখে তাকে অত্যন্ত অসহনীয় মনে করে) কসম খেয়ে বলবে যে (কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে)। তারা (অর্থাৎ আমরা বরযখে) এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি (অর্থাৎ কিয়ামত আগমনের যে সময়কাল নির্ধারিত ছিল, তা পূর্ণ না হতেই কিয়ামত এসে গেছে। উদাহরণত ফাঁসির আসামীকে এক মাস সময় দিলে যখন এক মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তার মনে হবে যেন এক মাস অতিবাহিত হয় নি, বরং বিপদ সত্বর এসে গেছে। আল্লাহ্ বলেন,) এমনিভাবে তারা (দুনিয়াতে) উল্টাদিকে চলত। (অর্থাৎ পরকালে যেমন সময়ের পূর্বে কিয়ামত এসে গেছে বলে কসম খেতে শুরু করেছে, তেমনি দুনিয়াতেও তারা কিয়ামত স্বীকারই করত না এবং আসবে না বলে কসম খেত।) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ ঈমানদার, কেননা তারা শরীয়তের জ্ঞানে জ্ঞানী,) তারা (এই অপরাধীদের জওয়াবে) বলবে, (তোমরা বরযখে নির্ধারিত সময়কালের কম অবস্থান করনি। তোমাদের দাবি ভ্রান্ত; বরং) তোমরা বিধিলিপি অনুযায়ী কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই কিয়ামত দিবস। কিন্তু তোমরা যে সময়কালের পূর্বে কিয়ামত এসেছে বলে মনে কর, এর কারণ এই যে, তোমরা দুনিয়াতে কিয়ামত হবে বলে জানতে না অর্থাৎ বিশ্বাস করতে না; বরং মিথ্যা বলতে। এই অস্বীকারের শাস্তিস্বরূপ আজ তোমরা অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছ। তাই অস্থির মনে এই ধারণা করছ যে, এখনও সময়কাল পূর্ণও হয়নি। দুনিয়াতে বিশ্বাস করলে কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে বলে মনে করতে না; বরং আরও তাড়াতাড়ি এর আগমন কামনা করতে। কারণ, মানুষ যে বিষয় থেকে সুখ ও শান্তির ওয়াদা পায়, সে স্বভাবতই তার দ্রুত আগমন কামনা করে। প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত তার জন্য কষ্টকর ও দীর্ঘ মনে হতে থাকে। হাদীসেও বলা হয়েছে, কাফির ব্যক্তি কবরে বলে, رب لا تقم الساعة এবং মু'মিন ব্যক্তি বলে, رب اقم الساعة মু'মিনগণের এই জওয়াব থেকেও বোঝা যায় যে, এখানে উল্লিখিত বরযখের অবস্থান সম্পর্ক মু'মিনগণ যথেষ্ট ভালোভাবে বোধগম্য করে নিয়েছিল। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা কিয়ামতের দ্রুত আগমনে আগ্রহান্বিত ছিল।) সেদিন জালিমদের (অর্থাৎ কাফিরদের অস্থিরতা ও বিপদ এরূপ হবে যে, তাদের) ওযর আপত্তি (সত্যমিথ্যা যাই হোক,) উপকারে আসবে না এবং তাদের কাছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির ক্ষতিপূরণ চাওয়া হবে না। (অর্থাৎ তওবা করে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার সুযোগ দেওয়া হবে না।) আমি মানুষের (হিদায়তের) জন্য এই কোরআনে (অথবা এই সূরায়) সর্বপ্রকার জরুরী) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। (সেগুলো দ্বারা কাফিরদের হিদায়ত হয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল। কিন্তু তারা হঠকারিতাবশত কবুল করেনি এবং বাঞ্ছিত উপকার

লাভ করেনি। কোরআনেই কি বিশেষত্ব, তাদের হঠকারিতা তো এতদূর পৌঁছেছে যে,) যদি আপনি (কোরআন ছাড়া তাদের) কোন ফরমায়েশী) নিদর্শনও তাদের কাছে উপস্থিত করেন, তবুও কাফিররা এ-কথাই বলবে, তোমরা সবাই (অর্থাৎ পয়গম্বর ও মু'মিনগণ---যারা কোরআনের শরীয়তগত ও আল্লাহ্‌র বিশেষ বিধানগত আয়াত-সমূহের সত্যায়ন করে, তারা) নিরেট বাতিলপন্থী। (তারা অর্থাৎ কাফিররা পয়গম্বরের ওপর যাদুবিদ্যার অপবাদ চাপিয়ে তাঁকে বাতিল বলছে এবং মুসলমানগণ যেহেতু পয়গম্বরের অনুসরণ করে অর্থাৎ তারা যেটাকে যাদু বলে অভিহিত করে মুসলমানগণ ওটাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেয়; সেহেতু তাদেরকে বাতিলপন্থী বলছে। প্রণিধানযোগ্য, তাদের এই হঠকারিতার ব্যাপারে আসল কথা এই যে,) যারা নিদর্শন ও প্রমাণাদি প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও) বিশ্বাস করে না, (এবং তা অর্জন করার চেষ্টা করে না) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হৃদয় এমনিভাবে মোহরাঙ্কিত করে দেন যেমন এই কাফিরদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রোজই নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ফলে আনুগত্যে শৈথিল্য এবং হঠকারিতার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে)। অতএব (তারা যখন এরূপ হঠকারী, তখন তাদের বিরুদ্ধাচরণ, নির্যাতন ও কটূকথার জন্য) আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা (এই মর্মে যে, এরা পরিণামে অকৃতকার্য এবং মু'মিনগণ কৃতকার্য হবে---তা) সত্য। (এই ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কাজেই অল্প দিনই সবর করতে হবে।) যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে যাই ঘটুক না কেন, আপনি সবর পরিত্যাগ করবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার একটি বড় অংশ কিয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন বর্ণনা করে অনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হয়ে যেতে অভ্যস্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বিশেষ কোনভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্য সে শক্তি লাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির যমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক।

خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ——বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও কতটুকু দুর্বল, বরং তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্বলতা ছিলে! তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশী চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয়; বরং ক্ষুদ্র একটি জগত। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোন বিশাল ওয়ার্কশপে নয়; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে।

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তার বিকাশ লাভের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا——অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষাদীক্ষার পালা শুরু হল। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতাপিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোঁট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট এ দু'টি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো এক ক্ষীণ শিশু। একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোন প্রয়োজনে চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোন কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়। এখন থেকে চলুন এবং যৌবন কাল পর্যন্ত তার ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিস্ময়কর নমুনা সামনে আসবে।

ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً——এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে আকাশ-কুসুম

পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল-গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে?)-এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তাঁর বিধানাবলীর অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ---হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এক সময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়---নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ---অর্থাৎ এগুলো সব সেই রাব্বুল ইযযতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা, পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কিনা এ বিষয় কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে?

অতঃপর আবার কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্খতা বর্ণিত হচ্ছে وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ---অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলীতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশী অবস্থান করে নি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ, তাদের দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কিয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপার উল্টা হয়ে গেছে। আমরা বরযখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হাযির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কিয়ামত তাদের জন্য সুখকর নয় বরং বিপদই বিপদ হয়ে

দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফিররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আযাব ভোগ করবে; কিন্তু কিয়ামতের আযাবের তুলনায় সেই আযাব আযাব নয়---সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।

হাশরে আল্লাহ্‌র সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি?ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফিররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশী থাকি নি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছেঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ---অর্থাৎ তারা কসম খেয়ে বলবে, আমরা মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা, রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণ মাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে এবং তার হস্তপদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হবে না। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الخ ---আয়াতের অর্থ তা-ই। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে----মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না ঃ এর বিপরীতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফিরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ (সা) কে? তখন সে বলবে هَا هَا لَا اَدْرِىْ ---অর্থাৎ হায়, হায়, আমি কিছু জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ্' বলে দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, কাফিররা আল্লাহ্‌র সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না।

কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তারা রাখে না। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফির ও পাপাচারীই কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনরূপ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

ইফাবা—৯৩-৯৪ প্র/১৪৮৪ (উ)—১০,২৫০

যাদের সহযোগিতায় তফসীর গ্রন্থখানি সংগৃহীত হয়েছে তাদের আখেরাতের নাজাতের জন্য দয়া এবং একান্ত দোয়া করবেন।